শ্রমিক জীবন

বাংলাদেশে শ্রমিকদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি, তাঁদের প্রতিদিনের লড়াই, বিভিন্ন ধরনের পেশার বাস্তব চিত্র নিয়ে গবেষণা খুবই কম। এবিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান, মালিকদের প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এমনকি শ্রমিক সংগঠন কোথাও পাওয়া কঠিন। এখানে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকের জীবনচিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই শিরোনামে আমরা নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে আগ্রহী। - সম্পাদনা পরিষদ

পাদুকা শ্রমিক

মাথার ওপরে কাঠের পাটাতন দিয়ে ছোট্ট একেকটা ঘরকে দুটো ঘরে পরিণত করা হয়। এই ঘরগুলোতে মাথা সোজা করে দাঁড়ানোর উপায় নেই, কুঁজো হয়ে বসে কাজ করতে হয়। এরকম অর্ধেক ঘরই পাদুকা শ্রমিকের 'কারখানা', আলো-বাতাসহীন এইসব কুঠুরিতেই দিনরাত একটানা কাজ করে পাদুকা শ্রমিকরা। এখানেই তাদের থাকা, খাওয়া, ঘুম।

সিদ্দিকবাজার, বংশাল, কামরাঙ্গিরচরসহ পুরান ঢাকার এইসব ছোট ছোট কারখানায় জুতা বা স্যান্ডেলের তলা বা সোল তৈরির কাজ যারা করে, তাদের 'সোলম্যান', ওপরের অংশটুকু প্রস্তুতকারকদের 'আপার ম্যান' আর দুই অংশ ফিটিং করার কারিগরকে 'ফিটিং ম্যান' বলা হয়। ডিজাইনের ওপর নির্ভর করে মজুরির রেট ঠিক হয়। সহজ ডিজাইন হলে প্রতি ১২ জোড়া জুতার ওপরের অংশের জন্য আপার ম্যান ১২০, সোল ম্যান ১২০ এবং ফিটিং ম্যান পায় ৫০-৬০ টাকা। সকাল থেকে কাজ শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত মোটামুটি ১৮ ঘণ্টা কাজ করলে এরকম ৪৮ জোড়া জুতার কাজ করতে পারে। অর্থাৎ ১৮ ঘণ্টা অমানুষিক কাজের মজুরি মেলে আপার ম্যান বা সোল ম্যানের মাত্র ৪৮০ টাকা। যে জুতার ডিজাইন আরেকটু জটিল, কাজ করতে বেশি সময় লাগে, যেগুলোর ১২ জোড়ার মজুরি ২৪০ টাকা, সেগুলো ১৮ ঘণ্টায় ২৪ জোড়া তৈরি করা যায়। এই হিসাবে ৮ ঘণ্টা কাজের মজুরি দাঁড়ায় মোটামুটি ২০০ টাকা। এ কারণেই তারা বাধ্য হয় টানা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে। রাতে কাজের জন্য কোনো ওভারটাইম বা বিশেষ ভাতা তাদের দেওয়া হয় না। কারখানায় থাকার কারণে বাসাভাড়া লাগে না, কিন্তু শুধু দুই বেলা ভাতের জন্যই খরচ হয় ৬০-৭০ টাকা। সকালে ও রাতের নাশতার খরচ যোগ করলে বাড়িতে পাঠানোর জন্য হাতে থাকে খুবই সামান্য। তা-ও যদি পর্যাপ্ত অর্ডার থাকে।

১৮ ঘণ্টা অমানুষিক কাজের মজুরি মেলে আপার ম্যান বা সোল ম্যানের মাত্র ৪৮০ টাকা।

দেশের বাজারে ভারত ও চীনের জুতা/স্যান্ডেলের অবাধ আমদানির কারণে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে এইসব ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা। মূলত শ্রমঘন শিল্পের মাধ্যমে হাতে তৈরি দেশি জুতা/স্যান্ডেল প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না চীন ও ভারতের যন্ত্রে তৈরি সস্তা জুতার সাথে। দেশে অ্যাপেক্সের মতো রপ্তানিমুখী বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নানা প্রণোদনা থাকলেও, ভারী যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কছাড়, রপ্তানি মূল্যের ওপর নগদ প্রণোদনা ইত্যাদি দেওয়া হলেও, দেশের মানুষের ব্যবহারের জুতা/স্যান্ডেল উৎপাদনকারী ও কয়েক লাখ শ্রমিক/কর্মচারী/পাইকার/খুচরা দোকানদারের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর জন্য আলাদা কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই সরকারের পক্ষ থেকে; এমনকি রেক্সিন, ফোম, অ্যাডহেসিভসহ জুতা/স্যান্ডেল তৈরির কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক মওকুফের সুবিধাটুকুও তারা পায় না।

শিল্পের অবস্থা ভালো থাকলে শ্রমিকরা তার সুফল পুরোপুরি ভোগ না করলেও শিল্পের খারাপ অবস্থার খেসারত তাদের পুরোপুরিই দিতে হয়। পাদুকাশিল্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। কাজের অভাবে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যেসব কারখানা কোনো রকমে টিকে আছে, সেখান থেকে শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। যারা আছে, তাদেরও নিয়মিত কাজ পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে সপ্তাহে দু-তিন দিন কেবল তারা পুরোদমে কাজ করতে পারছে।

সাধারণভাবে কারখানা শ্রমিকের যে ন্যূনতম অধিকারগুলো প্রাপ্য, তার কোনো কিছুই তারা পায় না–কাজের নিয়োগপত্র নেই, কোনো ন্যূনতম মজুরি নেই, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি তারা পায় না। 'কানামনা' ভিত্তিতে তারা কাজ করে। কানামনা অর্থাৎ কাজ নাই, মজুরি নাই। তাদের কাজের জায়গা ও থাকার জায়গা চরম অস্বাস্থ্যকর, আলো-বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিশুদ্ধ পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। দেখা গেল, পুরান ঢাকার একটা ঝুড়ঝুড়ে চারতলা ভবনের প্রতি ফ্লোরে গড়ে ২৫টির মতো রুম বা কারখানা মিলে মোট ১০০-র মতো 'কারখানা'। টয়লেট অপর্যাপ্ত। দাহ্য পদার্থ নিয়ে কাজ হওয়া এইসব কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা নিয়মিত; কিন্তু নেই কোনো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। অ্যাডহেসিভ, আইকা, চামড়া, ফোমসহ নানা রকম কেমিক্যালের তীব্র গন্ধের মধ্যে একরকম দমবন্ধ পরিবেশে গ্লাভস, মুখোশ ইত্যাদি ছাড়াই দিনরাত কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। কাজ করতে গিয়ে হাত কেটে গেলে কিংবা অসুস্থ হলে মালিক চিকিৎসার কোনো দায় নেয় না। কল-কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কোনো দিনও কারখানা পরিদর্শন করে না।

পাদুকা শ্রমিকদের দাবি–একদিকে অবাধে বিদেশি জুতা আমদানি বন্ধ করা, অন্যদিকে মজুরি বৃদ্ধি, নিয়োগপত্র প্রদান, চিকিৎসা সুবিধা, কর্মপরিবেশ ও বসবাসের পরিবেশের উন্নয়ন। - **কল্লোল মোস্তফা**

পুরান ঢাকার দর্জি শ্রমিক

সাদামাটা ডিজাইনের একটা ফুলশার্ট সেলাই করার মজুরি ১৩ টাকা আর হাফশার্টের ১১ টাকা! মেয়েদের একটা লেহেঙ্গা সেলাইয়ের মজুরি মোটামুটি ৪৫ টাকা। পুরান ঢাকার রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের এই মজুরি যে কবে নির্ধারিত হয়েছিল কেউ জানে না!

শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, লেহেঙ্গাসহ দেশের নারী-পুরুষ-শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় রেডিমেড পোশাক তৈরি হয় পুরান ঢাকার সদরঘাট, কেরানীগঞ্জ, গুলিস্তান, সাইনবোর্ডসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহুতল ভবনের ছোট ছোট রুমে ১০/২০/৩০ জন শ্রমিক নিয়ে গড়ে ওঠা কারখানাগুলোতে। যারা ১০ বছর ধরে এইসব কারখানায় কাজ করছে তারাও এই মজুরিতে কাজ করেছে, যারা ১৫ বছর ধরে আছে তারাও এসে মজুরির এই রেটই পেয়েছে। একজন শ্রমিক সারাদিনে ১৬টি শার্ট তৈরি করলে মজুরি মেলে ২০০ টাকা। আবার দুজন শ্রমিক মিলে সাত

দিনে ৬৫টি লেহেঙ্গা তৈরি করতে পারলে প্রতিটি ৪৫ টাকা দরে সাত দিনে দুজনের মজুরি হয় ২,৯২৫ টাকা, অর্থাৎ জনপ্রতি দৈনিক মজুরি সেই ২০০ টাকা। বাড়তি আয়ের জন্য শ্রমিকদের তাই গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। অর্জিত আয়ের একটা অংশ আবার মালিকদের কাছে আটকা থাকে, সেই আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য ঈদের আগে চাঁদরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় শ্রমিকদের, প্রায়ই সে সময় তাদের রেট কমিয়ে দিয়ে বঞ্চিত করে মালিকরা।

শার্ট-প্যান্ট হোসিয়ারি সামগ্রী পাইকারি ও খুচরা বিক্রির বড় বড় মার্কেটের ওপরের তলায় পাইকারি ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন ছোট ছোট এসব কারখানা অবস্থিত। রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস কারখানা থেকে সংগৃহীত পুরনো সেলাই মেশিন আর বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েই মালিকরা খালাস। এইসব কারখানায় আলো-বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নেই। নেই সুপেয় পানি সরবরাহ, আগুন লাগলে নেভানোর মতো সরঞ্জামও নেই। শ্রমিকদের কোনো নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না, কাজ করতে গিয়ে হাতে সুই ফুটে বা অন্য কোনোভাবে আহত হলে তার চিকিৎসা বা ক্ষতিপূরণেরও কোনো দায় মালিকের নেই। সবেতন সাপ্তাহিক কোনো ছুটি তারা পায় না। কানামনা বা 'কাজ নাই মজুরি নাই' ভিত্তিতে তারা কাজ করে।

এই রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন তাদের লিফলেটে এই মজুরি বৃদ্ধির দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে লিখেছে, *"যখন এই মজুরি নির্ধারিত হয়, তখন চালের মূল্য ছিল ১৩-১৪ টাকা। গত ১৫ বছরে চাল-ডাল-নুন-তেল, বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া বাড়লেও বাড়েনি এই শ্রমিকদের মজুরির হার। ১০ বছর আগে প্রতি গজ কাপড়ের দাম ছিল গড়ে ৫০-৬০ টাকা, যা বর্তমানে মালিকরা কিনছে ১২০ থেকে ১৫০ টাকায়। ১২-১৫ টাকার সুতা ৩০-৩৫ টাকা, ৭০০-৮০০ টাকার বকরম ১৪০০-১৫০০ টাকায় কিনছে। মালিকরা শুধু আগের মূল্যে কিনছে শ্রমিকের শ্রম। সদরঘাটে বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক কম ভাড়ায় বাসা নিয়ে থাকে কেরানীগঞ্জে। ১০ বছর আগে বুড়িগঙ্গা পারাপার হতে লাগত ৩ টাকা, বর্তমানে লাগে ১৪ টাকা। আবার মালিক আর শ্রমিক একই দোকান থেকে ৪০-৫০ টাকায় চাল কিনছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকার নতুন পে স্কেল ঘোষণা করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। তাহলে শ্রমিকদের মজুরি বাড়বে না কেন?"* এই প্রশ্ন আমাদের সকলেরই। - **কল্লোল মোস্তফা**

দুজন শ্রমিক মিলে সাত দিনে ৬৫টি লেহেঙ্গা তৈরি করতে পারলে প্রতিটি ৪৫ টাকা দরে সাত দিনে দুজনের মজুরি হয় ২,৯২৫ টাকা, অর্থাৎ জনপ্রতি দৈনিক মজুরি সেই ২০০ টাকা।

পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক

পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকরা কাজ করে এরকম একটি কারখানায় গিয়ে দেখা গেল, চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো বই নিয়ে টেবিলের মতো দেখতে একটা কাঠামোর সামনে টুলের ওপর বসে একটি বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি কিন্তু পড়াশোনা করছে না। যারা পড়াশোনা করবে, তাদের জন্য বই বাঁধাইয়ের কাজ করছে। 'বেঞ্চ'টি আসলে একটা গ্লু মেশিন, যেটি দিয়ে বইয়ের মলাট লাগানো হয়। আরেকটি ছেলে দেখা গেল হুইল হাতে কী যেন করছে। না, এটি কোনো থিম পার্কের খেলনা গাড়ির হুইল নয়, কাটিং মেশিংয়ের হুইল–যা দিয়ে রিম রিম ছাপা কাগজ কাটা হয়। পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করতেই গ্লু মেশিনের সামনে বসা ছেলেটি বলল, "আমরা যদি পড়াশোনা করি তাইলে বই বানাইব কে?"

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর, বাংলাবাজার, আরামবাগসহ বিভিন্ন স্থানে বিল্ডিংয়ের নিচতলায় আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘুপচি ঘর ভাড়া করে গড়ে ২০-২৫ জন শ্রমিক নিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি পুস্তক বাঁধাই কারখানা। ৮-১০ বছর বয়সে একেকটা ছেলে সেই যে কারখানায় ঢোকে, আর বের হতে পারে না। গোটা যৌবন কাটে ঘুপচি কারখানার ঘেরাটোপে বসে বসে ছাপা কাগজ ভাঁজ করা, কাটা, ইন্টারলিভিং, ম্যাচিং (তাদের ভাষায় 'মিছিল'!), সেলাই আর মলাট লাগানোর কাজে! বয়স হলে যখন আর আগের মতো হাত চলে না, দৃষ্টিশক্তি কমে আসে, তখন চলে যেতে হয়। কোথায় যায় কে জানে!

একজন প্রাপ্তবয়স্ক দক্ষ শ্রমিকের কাজ শুরু হয় সকাল ৮টায় আর শেষ হয় সেই রাত ১০টা-১২টায়। ৮টা থেকে ৫টা 'এক রোজ'-এর শ্রমমূল্য মাত্র ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা। ৫টা থেকে ১০টা আরেক 'রোজ'। শিশুদের বেলায় কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্তই কাজ করতে হয়, মাসকাবারি মাত্র দুই থেকে তিন হাজার টাকা। কারোরই কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। ছুটি নিলে বেতন মেলে না। তাদের কাজের নিয়ম হলো 'কানামনা' অর্থাৎ 'কাজ নাই মজুরি নাই'। এছাড়া আছে 'প্রডাকশন'ভিত্তিক মজুরি, যার রেট প্রতি হাজার ফর্মা কাগজ ভাঁজ করা, সেলাই করা, পেস্টিং করা, ম্যাচিং (মিছিল) করার ভিত্তিতে নির্ধারিত। বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই সমিতি ও মহানগরী পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সর্বশেষ ২০১৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, ১৬ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ২৭ টাকা, ৮ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ১৭ টাকা দেওয়া হয়। ম্যাচিং (মিছিল তোলাই) প্রতি হাজারের জন্য ৫ টাকা, পেস্টিং প্রতি হাজারে ২২ টাকা এবং ২ তসমা ২ জুস সেলাই প্রতি শত ৩.৪৫ টাকা দেওয়া হয়। এর আগে ২০১০ সালের সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ১৬ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ২০ টাকা, ৮ পেজ ভাঁজাইয়ের জন্য প্রতি হাজারে ১৪ টাকা দেওয়া হতো। ম্যাচিং (মিছিল তোলাই) প্রতি হাজারের জন্য ৩.৭৫ টাকা, পেস্টিং প্রতি হাজারে ২০ টাকা এবং ২ তসমা ২ জুস সেলাই প্রতি শত ২.৭৫ টাকা দেওয়া হতো। দেখা যাচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৪ সালে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই সামান্য। ২০১৪ সালে নির্ধারিত মজুরি এত কম হওয়ার পরও এবং ২০১৪ সালের পর দ্রব্যমূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ হলেও আজ পর্যন্ত এই বাঁধাই শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এই অতি নিম্নমজুরির কারণে তিন মাস পিক সিজনে ১৩ থেকে ১৬ ঘণ্টা অমানুষিক শ্রম দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের ৮-১০ হাজার টাকা মেলে। কিন্তু সারা বছর এরকম কাজ থাকে না, তখন একজন দক্ষ শ্রমিকের আয় মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা। দৈনিক খাওয়ার খরচের সাথে অন্যান্য খরচ যোগ দিলে কারখানায় সারা বছর বন্দি থেকে বাড়িতে পাঠানোর মতো তেমন কোনো অর্থ থাকে না হাতে। পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন গত ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতি বরাবর এক স্মারকলিপিতে এ বিষয়ে লিখেছে, *"...সংসার চালানোর জন্য দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হবে কেন শ্রমিককে অবসর, বিনোদন, পরিবারকে সময় দেওয়ার প্রয়োজন কি শ্রমিকের নেই বর্তমানে প্রচলিত মজুরির হার গত দুই বছরে বাড়েনি।*

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে, বাজারদরের সাথে সংগতি রেখে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি কি অন্যায়?... দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা বাঁধাই শ্রমিকরা সবেতনে সাপ্তাহিক ছুটিও পায় না। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা (অল্প কিছু কারখানায় দুপুর ২টা) পর্যন্ত কাজ করতে হয়। জাতীয় দিবস, এমনকি গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় সব কারখানায় কাজ চলেছে। দুই ঈদে সাত দিন করে ছুটি, তবে বিনা বেতনে। কোনো উৎসব বোনাস দেওয়া হয় না...”

বাঁধাই শ্রমিকরা সবাই কারখানায়ই থাকে। কারখানায়ই খাওয়া, কারখানায়ই ঘুম। বইগুলো একপাশে সরিয়ে ছারপোকায় আক্রান্ত ‘বিছানা’য় তাদের শ্রান্তির ঘুম। প্রেস থেকে মাঝরাতে ট্রাক ভর্তি ছাপা কাগজ এলে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে মাথায় করে বহনের কাজটাও তাদের। কারখানায় গোসল ও টয়লেটের ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত। বলা হতে পারে, শ্রমিকরা আর যা-ই হোক, বাড়িভাড়ার সুবিধাটুকু তো পাচ্ছে! বাস্তবে এই নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকাকে আদৌ কোনো সুবিধা বলা যায় কি না সেটা একটা প্রশ্ন। তার চেয়ে বড় কথা, কর্মস্থলে থাকার কথিত সুবিধার বিনিময়ে মালিক আসলে শ্রমিককে যখন-তখন বাড়তি খাটিয়ে নেওয়ার সুযোগ কাজে লাগায়, শ্রমিকের শ্রম-সময়ের সর্বোচ্চ সুবিধা মালিক গ্রহণ করে।

বাঁধাই কারখানায় কাগজ কাটার কাজে ব্যবহৃত কাটিং মেশিনগুলো সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হতে থাকা পুরনো ও ত্রুটিপূর্ণ মেশিন। এসব মেশিনে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা প্রায়ই নানা দুর্ঘটনার শিকার হয়, কারো কারো এমনকি হাতও কাটা পড়ে। কিন্তু আহত পঙ্গু শ্রমিকরা এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না। একটানা বসে কাজ করতে করতে কোমরে ব্যথা হয়ে যায়, সুইয়ের গুঁতোয় আঙুল হয় অসংখ্য ফুটো। এর জন্য কোনো চিকিৎসা সুবিধা শ্রমিকরা পায় না। বাঁধাই শ্রমিকদের কোনো নিয়োগপত্র নেই, ফলে নিয়োগ-ছাঁটাই সবই মৌখিক ভিত্তিতে হয়। মালিক ইচ্ছামাফিক শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারেন, শ্রমিকরা ছাঁটাই বাবদ কোনো ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারে না।

> ৮টা থেকে ৫টা ‘এক রোজ’-এর শ্রমমূল্য মাত্র ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা। ৫টা থেকে ১০টা আরেক ‘রোজ’। শিশুদের বেলায় কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্তই কাজ করতে হয়, মাসকাবারি মাত্র দুই থেকে তিন হাজার টাকা। কারোরই কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। ছুটি নিলে বেতন মেলে না।

নিয়োগপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, চিকিৎসা ভাতা, ক্ষতিপূরণ, ন্যূনতম মজুরি, সবেতন সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটি, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস ইত্যাদি সারা দুনিয়ায় শুধু পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদেরই নয়, সকল ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরই অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলাদেশের পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকরা এইসব ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁধাই শ্রমিকরা সেই ১৯৮১ সাল থেকে এই অধিকারগুলো ভোগ করে আসছে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে, শ্রমিক নিয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে নিয়োগপত্র প্রদান, ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করা শ্রমিকদের প্রতিবছর কাজের জন্য ১০ দিনের সমপরিমাণ বেতন গ্র্যাচুইটি হিসেবে প্রদান, ২০ জনের কম শ্রমিকসম্পন্ন কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকদের ১০ দিন উৎসব ছুটি ও ১৫ দিন বার্ষিক ছুটি এবং ২০ জনের অধিক শ্রমিকসম্পন্ন বড় কারখানায় ১৫ দিন উৎসব ছুটি ও ১৫ দিন বার্ষিক ছুটি প্রদান ও মহার্ঘ ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয় (সূত্র : অর্গানাইজিং আন-অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স : দ্য কেইস অব বাইন্ডারি ওয়ার্কার্স ইন ক্যালকাটা, বিশ্বজিৎ ঘোষ)। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঁধাই শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাংলাদেশের শ্রমিকদের বর্তমান মজুরির দ্বিগুণেরও বেশি; যেমন– পাঞ্জাবে একজন দক্ষ বাঁধাই শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৩৩১ রুপি (৩৮১ টাকা, প্রতি রুপি সমান ১.১৫ টাকা হিসাবে), বিহারে ৩০৬ রুপি (৩৫২ টাকা), তেলেঙ্গানায় ৩৭৯ রুপি (৪৩৬ টাকা) (সূত্র: http://www.paycheck.in)।

বাংলাদেশের ঘুপচি স্যাঁতসেঁতে আলো-বাতাসহীন কারখানাগুলো যেন একেকটা ‘স্যাক্রিফাইস জোন’। হয়তো কথিত উন্নয়নের জন্য এরকম অসংখ্য স্যাক্রিফাইস জোন কায়েম রাখতে হয়! রাষ্ট্রের খাতায় পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের কোনো অস্তিত্ব নেই, মজুরি বোর্ডের ন্যূনতম মজুরি তালিকায় এই শ্রমিকদের নামই নেই! কল-কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্তারাও এইসব কারখানায় পা ফেলেন না। **-কল্লোল মোস্তফা**

দেহশ্রমিক (পতিতা)

চাঁপা

'আমার ভাই আছে একটা। গ্রামে নানীর কাছে থাকে। মাথায় দোষ। ম্যালা কবিরাজ দেখানো হইছে। কিচ্ছুতে কিচ্ছু হয়না। এমনিতে ভালই থাকে। শীতের দিন আসলে পুরাই মাথা আউলাইয়া যায়। ছোটকালে নাকি ভালই ছিল। একবার আমার বাপে আইসা নিয়া গেছিল। বাপের দ্যাশ বরিশাল। সেইখানেও তার পরিবার আছে। এই দ্যাশে কাজের খোঁজে আইছিল। লঞ্চঘাটায় কুলির কাজ করত। তহন আমার মায়ের সাথে বিয়া। আমার ভাই হওয়ার পরে চইলা গ্যাছে নিজের দ্যাশে। অনেক বচ্ছর পর একবার আইছিল। কিছুদিন ছিল। তখন আমার জন্ম। ঐবারেই বাপে আমার ভাইরে সাথে কইরা নিয়া যায়। মা ভাবছিল, ভাইরে দিলে বাপের আসা-যাওয়া থাকবো। কিন্তু আমার বয়স যখন একবচ্ছর, বাপে তখন ভাইরে ফিরায়া দিয়া যায়, পাগল বইলা। আর কোনদিন আসে নাই। আমি তারে দেখি নাই।'

আমরা কথা বলছিলাম ওদের ঘরে বসেই। পদ্মার পাড় ঘেষে ওদের বাঁশের ঘর, টিনের ছাউনি। মা-মেয়ের সংসার। পদ্মার জল ভরা জোয়ারে ওদের ঘরের তলায় এসে ঠেকে। বাঁশের পাটাতনের ফাঁক দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ জলের কান্নায় ঘরময় দাপাদাপি। সে জলে রোজ রাতে মেশে চাঁপার চাপা কান্না। মেয়েটার নাম চাঁপা। শ্যামলা বরণ, কালোর ধার ঘেঁষে। বড় বড় চোখে ঘন পাপড়ি, কোকড়া চুল। অমন সুগন্ধি ফুলের নামে ওর নামকরণ যেন ব্যাঙ্গ করে ওকেই। কত বয়স মেয়েটার! বারো কি তেরো।

স্কুলে যাও?

নাহ!

যাও নাই কখনো?

গেছি। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ছিও। ছোট বেলায়। তারপর আর যাই নাই।

স্কুল বন্ধ করলে কেন?

স্কুলে যাইয়া কি হবে? লেখাপড়া করলেও খানকি, না করলেও খানকি।

এই বয়সী একটা বাচ্চা মেয়ের মুখে কি বেমানান লাগে শব্দটা! চমকে তাকাই। একটু আগেই ছটফটিয়ে কথা বলা মেয়েটি হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে যায়। ওড়নার খুট দাঁতে কাটছে যেন সব রাগ ঐ ওড়নার খুটের উপর।

কবে থেকে এই কাজ শুরু করেছো?
ওই যে কইলাম, ক্লাস ফোরে পড়তাম।
বিষ্যুদবার দুপুরে স্কুল ছুটি। আগে আগে ঘরে আইছি। মা ঘরে ছিল না। আমার মা লঞ্চঘাটার হোটেলে মসল্লা বাটে, তরকারি কোটে। দুপুরের ভাত হোটেল থেইকাই নিয়া আসে। মায়েরে যে খাইতে দেয় সেইটা আমরা দুই জনে খাই। ঘরে আইসা ঘুমায় পড়ছিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইছি জানিনা। মা ডাইকা উঠাইলো। দেখি আমাগো মাস কাবারি বাকি আনে যে মুদি দোকান থেইকা সেই দোকানদার ঘরে বসা। আমি উনারে চাচা ডাকতাম। মা কইল, ভাত রাইখা যাচ্ছি খাইস আর দোকানদার চাচা যা কয় শুনিস। কান্দা-কাটি করবিনা। মা যাওয়ার পর .. ..
গলা ধরে আসে চাঁপার। মাথা নিচু করে পাটাতনের ফাঁক দিয়ে জলের ধারা দেখে।
কিছুক্ষণ পরেই মা আসলে দোকানদার চাচা চইলা যায়। আমি ব্যাথায় হাউমাউ করে কান্দি, মা আমারে কোলে নিয়া নিজেও কান্দে।
দুই দিন ভাত ছুঁই নাই। মা'র উপর রাগ কইরা ভাবছি পদ্মায় ঝাঁপ দেই। পারি নাই। পারা যায় না'ক।

হিরাজান বিবি

অত ছোট্ট একটা মেয়েকে এই পথে নামালেন কেন? আপনি তো হোটেলে কাজ করেন। তা দিয়েই কি চলছিল না?
খানিকক্ষণ নিরুত্তর বসে থাকে মধ্যবয়সী হিরাজান বিবি, চাঁপার মা। যদিও ভেঙ্গে পড়া শরীর দেখে তাকে পড়ন্ত বয়সী বলে ভ্রম হয়। ভাঙ্গা চোয়াল, পানের কঁষে লালচে দাঁত আর ঠোঁট। সবুজ ছাপার সস্তা কাপড় মাথায় তুলে দিয়েছে, যদিও বুকের উপর তা এলোমেলো অবহেলায় পড়ে আছে। তার ফাঁক দিয়ে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া স্তনের নিচে বুকের পাজড়ের ওঠানামা পষ্ট। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মলিন চোখ তুলে তাকায়।
না। চলছিল না। চললে কি কোন মা তার ঐ ফোঁটা দুধের বাচ্চারে নিজের হাতে খুন দেয়! এর চাইতে অরে কাইট্টা গাঙ্গের পানিতে ভাসায় দিতাম। তাও ভাল আছিল। কিন্তুক আফা, মুখে তা কওন সোজা। সংসার মুখের কথা না গো।
তাই বলে অত অল্প বয়সে? ওর বয়স তখন কত ছিল? দশ, এগারো?
প্যাট তো আমার একটা না। মা-মাইয়া, বাড়ি মাথা খারাপ ছেইলা। বুড়া মা। ছেইলার চিকিচ্ছা। ওষুধ-বড়ি। এই যে ঘাটে থাকি, ঝুপড়ি ঘরে। তারও তো ভাড়া গুনতি হয় মাসে ছয়শো ট্যাকা। মসল্লা বাইটা আর তরকারি কুইট্যা কয় ট্যাকা রোজগার। ক্যামনে চালাই? ক্যামনে চলে? আর কামের মাইনষ্যেরও তো অভাব নাইক্যা। হোটেলে আইজ আমারে ছাড়ান দিলি পর কাইলই তারা লোক পাইবো। বাবুর্চির কথা না শুনলি আমারে ছাইড়া অন্য কাউরে নিবো। তহন? তা মনে করেন মিনি মাগনা গতর খাটাই। তারচায়া দুইট্যা পয়সা আসে। যেই সোয়ামী দু দুইট্যা পোলা-পান তুইল্যা দিয়া ভাগছে, তার জন্যি আর শরীর আগলাইয়া ছেইল্যা-মাইয়ারে মাইরা কি করুম কন?
আপনিও করেন এই কাজ?
নিজে না কল্লি কি মাইয়্যারে দেওন লাগত! হোটেলের বাবুর্চিরে দিয়া শুরু। মাস কাবারি সওদা আনি যে দোকান থিকা সেও হাত বাড়ায়। কুকথা বাতাসে ছড়ায় গো। এই ঘাটের আরও দোকানদাররা টের পায়, কেউ টের না পাইয়াও আসে। নিজের গরজেই আসে। তা ভাবছিলাম মাইয়ারে ইশকুলে দিছি। অরে কিছু বুঝতি দেব না।
পাপে কি আর বাপেরে ছাড়ে গো আফা। দোকানদারের আমারে দিয়া পোষাইল না। আমার পুরানা কাশি। হেয় কইল, আমার নাকি যক্ষা হইছে। আমার সাথে উঠা-বসা যাইত না। আসলে আমার চাঁপার দিক নজর গেল। পথম পথম রাজি হই নাই। হেয় বিরক্ত হইয়া বাকি দেওন বন্ধ কইরা দিল। পাওনা ট্যাকার জন্যি চাপ দেয়। কুল নিশানা পাই না গো। শ্যাষম্যাশ মনে অইল, কি আর হইব লেহাপরা শিখ্যা। বাপ যার জন্মের আগে ফালায় গ্যাছে, চার কুলে যার কেউ নাই। আমার কাশিও দিনিকে দিন বাড়বার লাগছে। রাইতে রাইতে শইল কাঁপাইয়া জ্বর আয়। শইলে জোর পাইনা। তা যদি সত্য সত্য যক্ষাই হইয়া থাকে, আমিও তো বেশি দিন নাই। তারপর! অর তো এই রাস্তা ছাড়া গতি নাই। তাই...
পদ্মায় ঢেউ ভাঙ্গে। ভাঙ্গাচোরা শরীর আর মন নিয়ে হিরাজান বিবি উদাস শুন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নিশ্চুপ।
আপনার ছেলে অসুস্থ হল কি করে?
অর বাপে তাগো দ্যাশে নিয়া গেছিল। পাগল বানাইয়া দিয়া গ্যাছে। সতীনের ছেইল্যা সহ্য হইব কেমনে! দিছে গাছড়া পড়া খাওয়াইয়া। সুস্থ থাকলে আইজ কি আমার চিন্তা থাকত কন? জোয়ান ছেইলা আমার, এতদিনে কামাইতে নামত। আর দেহেন আমার পোড়া কপাল, সেই ছেইলারে আজ আমার কামাই করে খাওয়ানো লাগে।
ডাক্তার দেখিয়েছেন?
কবিরাজ দেখাইছি। আমার সতীন তারে গাছড়া পড়া খাওয়াইয়া বান দিছে। বান ছুটে না। শীত আইলে পুরাই আউলা বইনা যায়। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তরও দেখাইছি। তারা বড়ি দিছে, কাম হয় নাই। বান মারা মাথার অসুখ। বড়িতে কি সারে! ডাক্তর কইল পাবনা নিতো। পাবনা মেন্টালে। নিছিলাম। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তরগো ছিলিপ, চেয়ারম্যানের চিঠি সবই নিয়া গেছিলাম। থুইয়া আসতে পারি নাই। সে তো হাসপাতাল না গো, জেলখানা। জেলখানা! প্যাটের ছেইলারে কোন পরানে জেলখানায় থুইয়া আসি কন? নিজের কাছেও রাখন যায় না। এই ফেরি ঘাটে গিজগিজা মানুষ। কার সাথে কোন দিক যায়! গেরামে মার কাছে থাকে। মনে করেন সেইখানে সবাই সবারে চেনে। এদিক ওদিক গেলেও খুঁইজা পাওন যায়।
গ্রামে আর কে কে আছে?
মা আছে। বুড়া। ভাই আছে। তার সংসার আলাদা। মা আর আমার মজনু একসাথ থাকে। খরচ আমি দিই।
স্বামীর কোন খবর জানেন না?
আর সোয়ামি! ছেইলা তুইলা দিয়া নিরুদ্দেশ হইল। সবই কপাল! নলি অমন দূরদ্যাশে, চিনিনে জানিনে, কোন খোজ বাত্তা নাই, অমন জাগায় বিয়া ক্যান হবে! কোলে দুধির বাচ্চা। মাইনষের বাড়ি কাম করবো তাও কত কষ্ট, কত কষ্ট। ছেইলের বয়েস পাঁচ বচ্ছর। আটানব্বইয়ের বন্যার আগে দিয়া হঠাৎই আইয়া হাজির। দ্যাশে বিয়া করছে, সংসার পাতছে। তার মায়ে নাকি জোর কইরা বিয়া দিছে। পুরুষ মাইনষের কথা গো আফা। নিজের লালোছ হইছে বিয়া করছে। দোষ চাপায় মায়ের উফ্রে। তা সেই বারে মাস ছয়েক আছিল। চাঁপা তহন আমার প্যাটে আইল। আমি তিন মাসের পোয়াতি, হে আবার চইলা গেল।
যাওনের সোম কইল, মজনুর মা, মজনুরে দাও, লয়া যাই। আমি তারে ইশকুলে ভত্তি দিমু। লেহাপড়া শিখামু। মনে ভাবলাম, ছেইলা নিয়া গেলে পর আওন যাওনটা থাকবো। এক্কেরে নিরুদ্দেশ হইত না। সেই ভাইবা দিলাম। বচ্ছর দুয়েক কোন খোজ-বাত্তা নাই। ঠিকানা দিয়া গেছিল, সেই ঠিকানায় পত্র দিছি। কোন উত্তর আসে নাই। চাঁপার বয়েস যখন বচ্ছর ঘুরল তহন ছেইলা দিয়া গেল। ছেইলার আমার

মাথা নষ্ট! খালি ভয় খায়। খালি ভয় খায়। রাত্তির কালে ঘুমের মধ্যিও চিক্কুর পাইড়া ওঠে। ছেইলা নিয়া কই যাই, কার কাছে যাই। কারে দেহাই। কোন কুল নিশানা পাই না। সেই কুল নিশানা আইজতক পাই নাই গো। মধ্যি গাঙ্গে হাবুডুবু খাই। কুল নাই, নিশানা নাই, গাঙ্গের পাড় নাই গো। ... - **বিধি চৌধুরি**

মহারাষ্ট্রের আখ শ্রমিক

আখ চাষ আর একে ঘিরে শতকোটি রুপির বিনিয়োগ শিল্পের আয়োজনে মহারাষ্ট্রের অবস্থান পুরো ভারতে দ্বিতীয়। আখ থেকে চিনি তৈরির জন্য কারাখানাগুলো প্রায় সম্পূর্ণই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত হলেও আখ চাষ, সেচকাজ, আখ কাটা, বোঝাই করা আর সব শেষে ফ্যাক্টরি গেটে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াই শ্রমনির্ভর। কারখানা মালিকরা মৌসুমের শুরুতে জমিতে আখ চাষ নিশ্চিত করতে কৃষকদের ঋণ দেন আর ভূমিহীন কৃষকরা আসে কারখানার মালিকানাধীন জমিতে কাজ করতে। আখ কাটার আগ পর্যন্ত জমির কাজে শ্রম চাহিদা স্থানীয়ভাবে মেটানো গেলেও অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আখ কাটা আর পরিবহনকাজের বিশাল শ্রম চাহিদার প্রায় পুরোটাই মেটে দূর-দুরান্ত থেকে মৌসুমি কাজের খোঁজে আসা শ্রমিকদের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রমিকরা বছরের বাকি সময় কর্মহীন থাকে আর অন্যদের কেউ খরাপীড়িত হয়ে আসে আবার কেউ বা ভূমিহীন কৃষক যারা মৌসুমি কাজ করে বীজ, সার ও কীটনাশকের খরচ জোগাতে আসে। ভাসমান এই শ্রমিকরা তাদের পারিপার্শ্বিকতার কারণে এতটাই নিরুপায় অবস্থায় থাকে যে দালালদের বেঁধে দেওয়া নামমাত্র মজুরিতে কোনো রকমে কাজ করার সুযোগ পেলেই এরা বর্তে যায়।

কথা হচ্ছিল সমর কালের সাথে। রাত তখন ৯টা। সারাদিন কাজের পর এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, এটা প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনা। সমর এখানে জমি থেকে আখ মাথায় বোঝাই করে কারখানার গাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে। প্রতিদিন তাকে মোটামুটিভাবে এক টন আখ বোঝাইয়ের কাজ করতে হয়। দিনে প্রচণ্ড রোদের তাপে এই কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই জিরিয়ে নিতে হয়। তাই দিনপ্রতি বেঁধে দেওয়া কাজের কোটা পূরণ করতে করতে কখনো রাত ৯টা, আবার কখনো ১০টা পর্যন্ত বেজে যায়।

সমরের সাথে কথা বলতে বলতে চলে যাই বেশ কিছুটা দূরে একটা ন্যাড়া জমির কাছে। এখানে ৬-৭টি ঝুপড়ির মতো ঘর। ঘর না বলে অবশ্য মাথা গোঁজার ঠাঁই বলাই ভালো। কারণ এখানে দরজা-জানালা বলতে কিছু নেই। পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা খড়ের আস্তরণ ওপর থেকে নেমে আসতে আসতে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। মাটির ওপরে চাদর বিছিয়ে বিছানা। পাশে পানির ঘটি আর মাটির খাদা। মাথার ওপরে আখক্ষেত থেকে কেটে আনা ছোবড়ার চালা। বিছানার পাশে একটা পুঁটলির মধ্যে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা জামা-কাপড়ের জটলা। এখানে দুজন থাকে। সমর আর একই গ্রাম থেকে আসা উমেশ। সমর রাঁধতে পারে না, কিন্তু রান্নার কাজের ভাগ পুষিয়ে দিতে হয় রান্নার সময় এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে আর দুজনের খাবার শেষে বাসনপত্র ধুয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রেখে।

উমেশের বয়স প্রায় ৩০। তিনি ১০ বছর ধরে একই কারখানার মালিকানাধীন আখক্ষেতে কাজ করছেন। ছয় মাস এখানে কাজ করে থাকা আর খাওয়া খরচ বাদ দিয়ে যে টাকা বাঁচে সেটা গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের জমিতে লাগায়। সেচের সুবিধা না থাকায় বছরে কোনোমতে একটা ফসল হয়। বাকিটা সময় এখানে না চলে এলে ঘরে বেকার বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। বেশ অবাক হয়েই জানতে চাইলাম যে ১০ বছর ধরে তিনি কেন একই জায়গায় কাজ করতে আসছেন! অন্য জায়গায়, অন্য কোনো কারখানায় বেশি মজুরি পেলে সেখানেও তো যেতে পারেন! কিন্তু জবাব পেয়ে বুঝলাম যে উমেশের মতো আরো অনেক শ্রমিকের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। শ্রম জোগান নিশ্চিত করতে এটা এক আশ্চর্য ফাঁদ, যেখানে মালিকরা টাকা দেন ফেরত না পাওয়ার জন্য, দালালরা ওই টাকা খাটায় শ্রমিকদের ঋণগ্রস্ত করার জন্য, আর স্থানীয় মহাজনরা চড়া সুদের বিনিময়ে ওই টাকা বিলাতে উন্মুখ হয়ে থাকে কৃষকদের ঋণের শিকল পায়ে পরানোর জন্য। কৃষক সেই টাকা জমিতে খাটানোর পর ফসল বেঁচে, সংসারের খরচপাতি মিটিয়ে সুদে-আসলে পুরো টাকাটা ওই মৌসুমে ফেরত দিতে পারে না। এর ফলে মহাজনের চাপে নিজ গ্রাম ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয় আখক্ষেতে। এখানে কাজ করে যে আয় হয়, সেখান থেকে ঋণের টাকা কেটে বাকিটা তার হাতে দেওয়া হয়। সেটা নিয়ে সে ফিরে যায় গ্রামে, মহাজনের থেকে নতুন করে কিছু টাকা ঋণ করে পুনরায় শুরু করে নিজ জমিতে ফসল লাগানোর প্রস্তুতি। নামমাত্র টাকা খাটিয়ে এভাবেই কারখানা মালিকরা নিশ্চিত করেন মৌসুমি শ্রমের জোগান। দালাল আর মহাজনরা ওই টাকা দিয়ে করে চড়া সুদের ব্যবসা। যতক্ষণ রক্ত পানি করা শ্রমের বিনিময়ে সেই টাকা পরিশোধের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এক মৌসুমে তারা থাকে নিজ জমির কৃষক আর আরেক মৌসুমে হয়ে যায় আখ শ্রমিক। এই বৃত্তবন্দি জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে তারা বেছে নেয় চরম মুক্তির পথ। আর এ কারণেই গত ২০ বছরে ভারতে আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ!

কথায় কথায় জানতে চাইলাম সমরের পরিবারের কথা। তারা দুই ভাইবোন। গত বছরই বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। সে সময় বেশ বড় রকমের যৌতুক দিতে গিয়ে সমরের বাবা স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে এক লাখ রুপি ঋণ নেন। আর সেই ঋণের শিকলে বাঁধা পড়ে সে এখন স্কুলের আঙিনা থেকে পরিবার-পরিজন ছেড়ে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকা অর্থনীতির জ্বালানি হতে চলে এসেছে মহারাষ্ট্রে। প্রতিদিন কাজের পর হাজিরা খাতায় তার নামের পাশে ২০০ টাকা জমা হিসেবে লেখা হয়। সপ্তাহান্তে খাওয়া আর অন্যান্য খরচের জন্য কিছু টাকা তুলতে পারে। বাকিটা মৌসুম শেষে গ্রামে ফিরে গিয়ে মহাজনের কাছ থেকে তুলতে হবে। টাকা দেওয়ার সময় বাবার করা ঋণের টাকার হিসাব মেটাতে বেশ বড় অংশই কেটে রাখা হবে।

সমরের বয়স ১৭ কি ১৮। পান খেয়ে দাগ বসিয়ে ফেলা দাঁত দেখে তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই। কিন্তু কিশোরসুলভ কথার সারল্যে তা লুকিয়ে রাখারও উপায় নেই। ভারতে এখন একদিকে মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারের ঢাক বাজছে, অন্যদিকে চলছে আরএসএসের শুদ্ধি অভিযান। একদিকে আছে লেবার কোর্টের মতো প্রতিষ্ঠান আর শ্রমিকের দুরবস্থা ঘোচাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা, অন্যদিকে আছে শিশুশ্রম ঠেকাতে কঠোর আইন। কিন্তু কিছুতেই সমরদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। লক্ষ্যের চালিকাশক্তি লোভ হওয়ায় ওপরতলার চুইয়ে পড়া রস নিচে আসতে আসতে শুকিয়ে যায়। ভারতের সমর বাংলাদেশে এসে নাম পাল্টে হয়ে যায় সুমন। নামের এই পার্থক্যটুকু ছাড়া জিডিপির জ্বালানি হয়ে পুড়তে থাকা এদের সবার জীবনের গল্প মোটামুটি একই। **-মওদুদ রহমান**

(মারাঠি ভাষায় কথোপকথনে সাহায্য করেছেন প্রকৌশলী আকেশ মেশরাম)